বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব-২)

মুহম্মদ মতিউর রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

প্রথম পর্বঃ [বাংলা সনের উৎপত্তি ও বিকাশ]

হিজরী সনের প্রবর্তন করেন মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং। দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারূক (রা.) আনুষ্ঠানিকভাবে এটা চালু করেন। মহানবীর (সা.) ঐতিহাসিক হিজরতের ঘটনার স্মরণে হিজরী সনের উৎপত্তি। মহানবী (সা.) মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে ৬২২ ঈসায়ীর ২০ সেপ্টেম্বর নিজ জন্মভূমি পবিত্র মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। ঐ সময় আরবদেশে বহুবিধ সনের প্রচলন ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের স্মরণে □বন্যাসন□, আবরাহার হস্তিবাহিনী নিয়ে কা□বা ধ্বংসের অপচেষ্টার স্মরণে □হস্তি সন□, □হবুতি সন□, □লুই সন□, □খসরু সন□, মহানবীর (সা.) জন্ম সন□, □আম উল ফজুর□, □আম উল ফতেহ□ ইত্যাদি সন প্রচলিত ছিল। তবে এর অধিকাংশই ছিল আঞ্চলিক বা গোত্রীয়, ব্যাপকভাবে বা সারাদেশে এ সনগুলোর প্রচলন ছিল না। এর মধ্যে □হস্তি সন□ কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মহানবীর (সা.) জন্মের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে ইয়েমেনের শাসক আবরাহা বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে খানায়ে কা□বা ধ্বংস করতে এসে মক্কার অদূরে মুযদালিফার ওয়াদিউন্নার (অর্থ : অগ্নি-উপত্যকা) নামক স্থানে আল্লাহ্‌ ইচ্ছায় ক্ষুদ্র আবাবীল পাখির প্রস্তরাঘাতে সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে হস্তি সনের উৎপত্তি। সেকালে এ ঘটনা সমগ্র আরব সমাজে ছিল এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। ফলে এ সন মোটামুটি ব্যাপকভাবে গৃহীত ও আদৃত হয়।

তবে এ সনটি ছিল এক অভিশপ্ত জালেম শাসকের স্মৃতিবাহক। তাই মহানবী (সা.) ইসলামের ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা হিজরতের স্মরণে হিজরী সন প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেদিন তদানীন্তন ইয়াসরিফ- যা মহানবীর (সা.) আগমনের সাথে সাথে □মদীনাতুর রাসূল□ নাম ধারণ করে- উপনীত হন, সেদিন থেকেই হিজরতের স্মরণে নতুন সন গণনার নির্দেশ দেন। তিনি নজরানের খ্রীস্টানদের সাথে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন তাতে তারিখ হিসাবে হিজরতের পঞ্চম দিন উল্লেখ করা হয়। ঐ সময় থেকে মদীনায় হিজরতের প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর এভাবে লোকমুখে এ সনের প্রচলন ঘটে। কিন্তু এভাবে হিজরী সনের প্রচার ও তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও বিধিবদ্ধভাবে এ সন প্রচলিত হয় খলিফা উমরের (রা.) শাসনামলে ৬৩৮ ঈসায়ীতে। এর পটভূমি নিম্নরূপ :

বিশিষ্ট সাহাবা আবূ মূসা আশআরী (রা.) খলীফা উমরকে (রা.) জানান যে, খলীফার ফরমান ও পত্রাদিতে নির্দিষ্ট দিন-তারিখের উল্লেখ না থাকায় তা অনেক সময় নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে খলীফা উমর (রা.) বিশিষ্ট সাহাবাদের নিয়ে এক পরামর্শ সভা ডাকেন। সভায় আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) হিজরতের বছর থেকে নতুন সন গণনার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সকলেরই মনঃপূত হয়। কারণ স্বয়ং মহানবীর (সা.) হিজরতের দিন থেকে তারিখ গণনার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। তবে সেটা তখনও প্রথাগত সন হিসাবে সুবিন্যস্ত হয়নি। তাই পরামর্শ সভা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হিজরতের বছর থেকে নতুন হিজরী সন গণনা করা হবে। এ নতুন সনে তৎকালে আরবদেশে প্রচলিত মাসসমূহের নাম বহাল রাখা হয়। কারণ এ মাসগুলির সঙ্গে আরবদেশের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। আল-কুরআনেও এ মাসগুলির উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীস শরীফে এ মাসগুলোর ভিত্তিতে বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগীর সুস্পষ্ট বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাই এ মাসগুলোর নাম এবং ক্রম পরিবর্তন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ কারণে হিজরী সন গণনার ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন পড়ে।

তখন আরব দেশে বছরের প্রথম মাস ছিল মুহররম। খলিফা উসমান বিন আফ্‌ফানের (রা.) প্রস্তাব ও সকলের সম্মতিতে হিজরী সনের প্রথম মাস হিসাবে এটা অপরিবর্তিত থাকে। যদিও হিজরত সংঘটিত হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। কিন্তু প্রচলিত রীতি ও প্রথার সাথে মিল রেখে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এভাবে প্রচলিত আরবি সনের প্রথম মাস ও তারিখের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার উদ্দেশ্যে হিজরতের দুই মাস আট দিন পিছিয়ে পয়লা মহররম থেকে হিজরী সন গণনা শুরু হয়। সে হিসাবে হিজরী সনের শুরু ৬২২ ঈসায়ীর ১৬ জুলাই অর্থাৎ হিজরতের বছর থেকে। ৬৩৮ ঈসায়ীতে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা তাঁর খিলাফত কালে তৎকালিন বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সকলের সম্মতিক্রমে হিজরী ১৭ সনে ১০ জমাদিউল আউয়াল বুধবারের দিন এক আমিরী ফরমান বলে হিজরী সন চালু করেন। সেই থেকে সমগ্র বিশ্বে বিশেষত মুসলিম বিশ্বে হিজরী সন চালু আছে।

বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ শাসনামল ও সিংহাসনারোহণ ও বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করে পৃথিবীতে বিভিন্ন সনের প্রচলন ঘটে। উপমহাদেশেও এভাবে বিভিন্ন সনের উদ্ভব ঘটেছে। এভাবেই শকাব্দ, হর্ষাব্দ, অশোকাব্দ, গুপ্তাব্দ, ফলাব্দ, বিক্রমাব্দ বা বিক্রম সম্বৎ, পালাব্দ, ভারত সন, শালিবন সন, জালালী সন, সেকান্দর সন ইত্যাদি সনের উৎপত্তি হয়। বাংলা সনেরও উৎপত্তি ঘটে মুঘল সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে। বাংলার স্বাধীন নবাব হুসেন শাহের আমলে বাংলা সনের উৎপত্তি হয় বলে অনেকের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সকল ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সম্রাট আকবরের আমলেই এ সনের উদ্ভব ঘটে। “আকবর নামা”র বিবরণ থেকেও এটা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়।

মুঘল আমলে উপমহাদেশে সরকারীভাবে হিজরী সন চালু ছিল। যদিও সম্রাট আকবর তাঁর প্রবর্তিত “দ্বীনে এলাহী”র স্মরণে “এলাহী সন” চালুর চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাতে সফল হননি। হিজরী সন চান্দ্র মাসের হিসাবে গণনা করা হয়। সেকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সনের অধিকাংশই চান্দ্র মাসের হিসাবে গণনা করা হতো। তখন বাংলাদেশে অন্যান্য সনের সাথে লক্ষ্মণ সনও প্রচলিত ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসনারোহণের সময় থেকে এ সন গণনা করা হতো। এটাও ছিল চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী। চান্দ্র বছরের সাথে সৌর বছরের পার্থক্য ১০/১১ দিন। এ গরমিল দূর করে চান্দ্র বর্ষের হিসাবকে সৌরবর্ষের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য হিন্দু জ্যোতিষীগণ প্রতি তিন চান্দ্র বছরে এক মাস অতিরিক্ত যোগ করে দিতেন। এ মাসটিকে তারা বলতেন “মলমাস”। সন গণনার এ অসংগতি দূরীকরণার্থে এবং খাজনাদি আদায় ও রাজকীয় অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের সুবিধার্থে একটি নতুন সন চালু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে সম্রাট আকবর তাঁর নবরত্নের অন্যতম বিজ্ঞ আমীর ফতেহউল্লাহ শিরাজীকে নতুন সন উদ্ভাবনের নির্দেশ দেন।

“আমীর-উল মুল্ক”, “আযাদ-উদ্-দৌলা”, “রোস্তম সানী” প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ও পণ্ডিত ফতেহউল্লাহ সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরী বা ১৫৫৬ ঈসাব্দ পর্যন্ত হিজরী সনকে অপরিবর্তিত রেখে পরবর্তী সময় থেকে নতুন সন সৌরমাসের হিসাব অনুযায়ী গণনার ব্যবস্থা করে বাংলা সন উদ্ভাবন করেন। এভাবে হিজরী সনের ভিত্তিতে বাংলা সনের উৎপত্তি হলেও পরবর্তীতে নতুন সনের হিসাব সৌরবছরের সাথে যুক্ত হওয়ায় দুই সনের মধ্যে বছরে ১০/১১ দিনের এবং ৩৩ বছরে এক বছরের ব্যবধান তৈরি হয়। ফলে নতুন সনের প্রবর্তনের সময় থেকে বিগত ৪৫৫ বছরে (২০১১ খ্রি:) হিজরী সনের সাথে এর প্রায় ১৪ বছরের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। কালপরিক্রমায় এ ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সম্রাট আকবর ফসল বোনা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তাঁর রাজত্বকালের উনত্রিশতম বছর অর্থাৎ ১৫৮৫ ঈসায়ীতে শাহী ফরমান জারি করে এ নতুন সন চালু করেন। চালু করার পর এ সন “ফসলী সন” হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশে অনেকে এটাকে বঙ্গাব্দ নামেও অভিহিত করে থাকেন। “ফসলী” লকবটিও বহাল থাকে। আকবরের রাজত্বকালে ঐ সময় ফসলী সন হিসাবে উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে যথাক্রমে “বিলায়তি” ও “সুরসান” নামে আরো দুটি সন চালু হয়। এ দুটি সনকেও বাংলা সনের মতই হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা আদায়, অন্যান্য কর সংগ্রহ ও প্রজাসাধারণের সাথে শাহী দরবারের লেনদেনের তারিখ নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নতুন সনগুলো ব্যবহৃত হলেও মুঘল রাজ-দরবার ও মুসলিম সমাজে সর্বত্র যথারীতি হিজরী সন চালু থাকে।

বাংলা সন হিজরী সন থেকে উদ্ভূত হলেও এর মাসগুলোর নাম তৎকালে প্রচলিত শকাব্দের সাথে মিল রেখে করা হয়। হিজরী ও বাংলা এ দু’টি সনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। শুরুতে বাংলা মাসের নাম ছিল যথাক্রমে- কারওয়াদিন, আরদিভিহিসু, খারদাদ, তীর, আমরারদাদ, শাহরিয়ার, মিহির, আবান, আয়ুর, দায়, বাহমান ও ইসকান্দার মিয। পরবর্তীতে সেগুলো শকাব্দের মাসের নাম অনুযায়ী রাখা হয়। শকাব্দের নামগুলো গ্রহপুঞ্জ ও সূর্যের নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন “বিশাখা” নক্ষত্রের নামে বৈশাখ, “জ্যেষ্ঠা” থেকে জ্যেষ্ঠ, “আষাঢ় পদ” থেকে আষাঢ়, “শ্রাবণী” থেকে শ্রাবণ, “ভাদ্রাদি” বা “ভাদ্রপদ” থেকে ভাদ্র, “অশ্বিনী” থেকে আশ্বিন, “কৃত্তিকা”

থেকে কার্তিক, ‘পূষ্যা’ বা ‘পুষ্প’ থেকে পৌষ, ‘মঘা’ থেকে মাঘ, ‘ফল্গুনী’ থেকে ফাল্গুন এবং ‘চিত্রা’ থেকে চৈত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা সনের প্রথম মাস কোনটি ছিল, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন, প্রথম দিকে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম দিন হিসাবে গণনা করা হতো। সেকালে বাংলাদেশের প্রধান দুটি ফসলের মধ্যে একটি আমন ও অন্যটি আউষ ধান। আমন ধান আগ্রহায়ণ মাসে আর আউষ ধান বৈশাখ মাসে কাটা হতো। সে অর্থে আগ্রহায়ণ মাসকেও ফসলী সনের প্রথম মাস গণ্য করা বিচিত্র নয়।

উপরোল্লিখিত মাসগুলোর মধ্যে একমাত্র অগ্রহায়ণ মাসটি কোন নক্ষত্রের নামানুসারে হয়নি। ‘অগ্র’ থেকে অগ্রহায়ণ। এ অর্থে অগ্রহায়ণকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে গণ্য করা অসঙ্গত ছিল না। অন্য মত হলো এই যে, নতুন সন যখন প্রচলন করা হয় তখন ছিল বৈশাখ মাস। তাই বৈশাখ মাসকেই বছরের প্রথম মাস গণ্য করা হয়। ফসল কাটার মাস হিসাবেও বৈশাখের গুরুত্ব রয়েছে। অগ্রহায়ণ মাস আমন ধান কাটা ও মাস-মশুর-সরিষা আবাদের মওসুম হলেও বৈশাখে বাঙালির প্রধান ফসল আউস ধান, তিল, কাউন, প্রধান অর্থকরী ফসল পাট ইত্যাদি কাটার মওসুম। এ সময় বাংলাদেশের প্রধান ফল আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেয়ারা, কলা, লেবু, আম্রা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি ফল পাকে। এজন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠকে ‘মধুমাস’ও বলা হয়। নানারূপ ফসল ও ফল পাকার মাস হিসাবে বৈশাখ মাসে নানাবিধ উৎসব-আনন্দেরও আয়োজন হয়ে থাকে। এজন্য বাংলা সনের প্রথম মাসটির একটি আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। যেকোন কারণেই হোক, বর্তমানে বৈশাখ মাসই বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। এখন এটাই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

সম্রাট আকবরের সময় মাসের প্রতিটি দিনের জন্য পৃথক নাম ছিল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে এ প্রথা বিলুপ্ত করে সপ্তাহের সাতটি দিনের জন্য সাতটি নাম নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত এ সাতটি নামের সাথে রোমান সাপ্তাহিক নামগুলোর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

হিজরী সনের পর অন্য যে সনের সাথে বাংলা সনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো শকাব্দ। রাজা চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ৩১৯ অব্দে গুপ্তাব্দ প্রবর্তন করেন। এ সন পরবর্তীতে ‘বিক্রমাব্দ’ নামে অভিহিত হয়। প্রথমে এ ‘অব্দ’ শুরু হতো চৈত্র মাস থেকে। পরবর্তীতে কার্তিক মাসকে বছরের প্রথম মাস গণ্য করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৫ সনে ভারতে শক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শকদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শকাব্দ চালু হয়। তখন থেকে বিশাখা নক্ষত্রের নামানুসারে সৌরভিত্তিক শকাব্দের প্রথম মাসের নাম রাখা হয় বৈশাখ। সেদিক থেকে শকাব্দ ও বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম অভিন্ন। বাংলা সনের অন্যান্য মাসের নামও শকাব্দের মাসের নাম থেকে গৃহীত হয়েছে। তবে শকাব্দের বৈশাখ মাস যে দিন থেকে শুরু হয়, তার একদিন আগে শুরু হয় বাংলা সনের প্রথম মাস। একারণে আমাদের বৈশাখ আর শকাব্দের বৈশাখের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুদের পূজা-পার্বণ শকাব্দের তারিখ অনুযায়ী প্রতিপালিত হয়।

বাংলা সনের কোন মাস ২৯, কোন মাস ৩০, ৩১ এমনকি ৩২ দিনে গণনার নিয়ম থাকায় এবং এ সম্পর্কিত আরো কিছু সমস্যা থাকায় এ সমস্ত সমস্যা ও জটিলতা দূর করে বাংলা সনের বিভিন্ন দিন-তারিখ একটি বৈজ্ঞানিক ও স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী প্রাচ্যের প্রখ্যাত মনীষী, বহু ভাষাবিদ, জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে ঈসায়ী ১৯৬৩ সনের মে মাসে ‘বাংলা সালের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণ উপ-সংঘ’ নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এ উপ-সংঘ বা কমিটি ছিল নিম্নরূপ :

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সভাপতি), অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (তদানীন্তন পরিচালক, বাংলা একাডেমী), অধ্যক্ষ আবুল কাসেম (সদস্য), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শিরোমণি, জ্যোতিভূষণ (সদস্য), শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কাব্য-জ্যোতিষতীর্থ (সদস্য), পণ্ডিত তারাপদ ভট্টাচার্য কাব্য ব্যাকারণ পুরাণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতিশাস্ত্রী (আহ্বায়ক)। উক্ত উপ-সংঘ দীর্ঘ তিন বছর নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা-পর্যালোচনার পর সহজ পদ্ধতিতে বাংলা সনের বিভিন্ন মাসের তারিখ নির্ধারণের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেন :

‘ক. মুঘল আমলে বাদশাহ আকবরের সময়ে হিজরী সনের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যে বংগাব্দ প্রচলিত করা হয়েছিল তা থেকে বছর গণনা করতে হবে।

খ. ইংরেজি মাস ২৮, ৩০ কিংবা ৩১ দিনে হয়। উপসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা মাস গণনার সুবিধার জন্য বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাসের প্রতি মাস ৩১ দিন হিসাবে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাকী সাত মাস ৩০ দিন হিসাবে গণ্য করা হবে।

গ. অধিবর্ষের (লিপইয়ার) চৈত্র মাস ৩১ দিনে হবে। ৪ দ্বারা যে সাল বিভাজ্য, তাই অতিবর্ষ বলে পরিগণিত হবে।’ (দ্র. মুহম্মদ

আবু তালিব : বাংলা সনের জন্মকথা, পৃ. ৪৮)

ঈসায়ী ১৯৬৬ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত উপসংঘের শেষ বৈঠকে এ সুপারিশমালা পেশ করা হয়। এ বৈঠকে উপসংঘের সকল সদস্য ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বাংলা একাডেমীর জীবন-সদস্য অধ্যাপক এম. এ. হামিদ টি. কে. এম. এস-সি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যেঃ □যেহেতু রাশি, নক্ষত্র এবং ঋতুর সংগে বাংলা মাসের পর্যায়ক্রম নির্ণয় হয়, সেইজন্য বৈশাখ মাস ১লা এপ্রিল হইতে গণনা করা সম্ভবপর নহে। মুঘল আমলে আকবরের সময় যে বংগাব্দ প্রচলিত করা হইয়াছিল তাহা হইতেই বৎসর গণনা করিতে হইবে এবং সেই হিসাবে আগামী পহেলা বৈশাখ হইবে ১৩৭৩ বাংলা সাল। বাংলা একাডেমীর তরফ হইতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৩৭৩ সালের জন্য একটি দেওয়াল পঞ্জি তৈয়ার করিতে হইবে।□ (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮)

উপসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা একাডেমী ১৩৭৩ বাংলা সন থেকে উক্ত সুপারিশের আলোকে যথারীতি দেয়াল পঞ্জি প্রকাশ করে। ১৩৭৭ সনে (ঈসায়ী ১৯৭০) বাংলা একাডেমী উক্ত সুপারিশের আলোকে একটি ডায়েরীও প্রকাশ করে। ১৯৭৭ ঈসায়ীতে বাংলাদেশ সরকার বাংলা একাডেমীর বর্ষপঞ্জি সর্বত্র চালু করার নির্দেশ দেন। অতঃপর ১৯৮৮ সনে বাংলাদেশ সরকার পহেলা বৈশাখকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেন। তখন থেকে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ সরকারী ও বেসরকারীভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র জাঁকজমকের সাথে প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

বাংলা সনের ইতিহাসে উপরোক্ত ঘটনাক্রমগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। বাংলা সনের উদ্ভাবক আমীর ফতেহউল্লাহ শিরাজীর নামের সাথে এভাবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কমিটি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর নামও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমানে উক্ত সংশোধিত বাংলা সনই বাংলাদেশে প্রচলিত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা সন আর পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সন এক নয়, তাদের পঞ্জিকাও ভিন্ন। মুসলমানদের দ্বারা আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত এবং সর্বোপরি হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৭ ঈসায়ীতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছে। এরদ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং বাংলা সনের সাথে একাধারে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দেশীয় ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক যোগসূত্র প্রমাণিত হয়। বস্তুত বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা সন বিজ্ঞানসম্মত এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রধানত খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে মুঘল আমলে হিজরী সনকে সৌর হিসাবে পরিবর্তিত করে বাংলা সন তৈরী করা হয়। ফলে বৈশাখ থেকে চৈত্র এটা রাজস্ব-বর্ষ হিসাবে গণ্য হয়। ইংরেজ আমলে সরকারী কাজে ঈসায়ী বা গ্রেগরীয়ান বর্ষ চালু হলেও রাজস্ব আদায়ের জন্য পুরনো রাজস্ব-বর্ষই চালু থাকে। তখন সরকার এবং জমিদার শ্রেণী উভয়েই বাংলা সনের হিসাবে রাজস্ব আদায় করে। পাকিস্তান আমলে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলেও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার অদ্যাবধি ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলা সনের হিসাব বহাল রেখেছেন।

উপরে সনের হিসাব সংরক্ষণের গুরুত্ব, বিভিন্ন সনের উদ্ভব ও বাংলা সনের জন্ম ও তার ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, বাংলা সনের সাথে আরবি হিজরি সনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এর সাথে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, ঋতু-পরিবর্তন, সামাজিক অবস্থা ও জীবন-বৈচিত্র্যের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

মুহম্মদ মতিউর রহমান

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান এর জন্ম ৩ পৌষ, ১৩৪৪ (১৯৩৭ ইং) সন, সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর নরিনা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস উক্ত একই উপজেলার চর বেলতৈল গ্রামে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সনে বাংলায় এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কলেজ ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকল্পে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সংগঠক হিসেবে তাঁর রয়েছে বৈচিত্রময় ভূমিকা। তিনি ঢাকাস্থ "ফররুখ একাডেমীর" প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলা একাডেমীর জীবন সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য কথা (১৯৯০), ভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৭১), মহৎ যাদের জীবন কথা (১৯৮৯), ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য (১৯৯০), ফররুখ প্রতিভা (১৯৯১), বাংলা সাহিত্যের ধারা (১৯৯১), বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (১৯৯২), ইবাদত (১৯৯৩), মহানবী (স) (১৯৯৪), ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৯৫), মহানবীর (স) আদর্শ সমাজ (১৯৯৭), ছোটদের গল্প (১৯৯৭), Freedom of Writer (১৯৯৭), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (২০০২), মানবাধিকার ও ইসলাম (২০০২), ইসলামে নারীর মর্যাদা (২০০৪), মাতা-পিতা ও সন্তানের হক (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০৪), স্মৃতির সৈকতে (২০০৪)। এছাড়াও তাঁর সম্পাদনায় ফররুখ একাডেমী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।